Academic Journal

Vol. 14

2021

DUM DUM MOTIJHEEL RABINDRA MAHAVIDYALAYA
Affiliated to West Bengal State University

ISSN : 2331-315X

ISSN : 2331-315X

NAAC accredited Institution

DUM DUM MOTIJHEEL RABINDRA MAHAVIDYALAYA

Affiliated to West Bengal State University (Barasat, North 24 Pgs.)

A Peer-Reviewed Multidisciplinary

ACADEMIC JOURNAL 2021

Vol. 14

Edited by
Dr. Kamal Sarkar
Dr. Apurba Pahar

Contents

	Page No.
Hari Bol – The Genesis & Communication of Funeral Music in Bengal – *Argha Sen*	9
The Indian Dream between failure and success in Aravind Adiga's *Selection Day* – *Barsha Bera*	15
The Soldiers of Hitler — The Ultimate Marginalised – *Brahmananda Chakraborty*	22
Familial Disintegration under the Veil of Cohabitation: A Study of Counter-Culture in Sam Shepard's Buried Child – *Dr Kamal Sarkar*	25
Evolution of a New Poetic Genre: Dramatic Monologues of Robert Browning – *Samarjit Dutta*	31
গুপ্তাধিকার পর্বে বাংলায় ভূমিদান পট্টগুলিতে সামাজিক পরিচয়দানের রীতি – *দুর্গা শংকর কোলে*	36
সামান্য সম্পর্কে বৌদ্ধ মত – *মধুমিতা চ্যাটার্জি*	43
স্বামী বিবেকানন্দ ও নব্য বেদান্ত: একটি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ – *ড. শর্মিষ্ঠা মিত্র*	48
শতবর্ষে রমাপদ চৌধুরী : নির্বাচিত গল্পের প্রেক্ষিত সন্ধান – *ড. উত্তরা কুণ্ডু চৌধুরী*	59

স্বামী বিবেকানন্দ ও নব্য বেদান্ত: একটি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ

ড. শর্মিষ্ঠা মিত্র

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়

প্রাক্‌কথন: স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন উনিশ শতকে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নতুন যুগসঞ্চারের অন্যতম পুরোধা। অনেকেই অত্যন্ত সংগত কারণেই স্বামী বিবেকানন্দকে বাংলা নবজাগরণের প্রধান সৈনিক বলে মনে করেন। বর্তমান সময়ে সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মানুষ জীবনের সুখ অন্বেষণের তাগিদে বস্তুজগতের মায়াময় হাতছানির করালগ্রাসে নিমজ্জিত। আধুনিকীকরণ ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের সুখ, শান্তি, প্রয়োজন বা চাহিদার পরিভাষাও আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। সময়ের এই প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী বা মতাদর্শ বিশেষত ফলিত বেদান্ত বা ব্যবহারিক বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁর মতামত যেন আরও বেশি রকম প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধটিতে ফলিত বেদান্ত বা বেদান্তের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে স্বামীজির মতামত অত্যন্ত সরলীকৃতভাবে পাঠকের সম্মুখে এনে দেওয়ার প্রয়াস করা হল। সরাসরি মূল বিষয়ের মধ্যে মনোনিবেশ করার প্রারম্ভে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন যে বিষয়গুলি পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত করা না গেলে Practical Vedanta বা প্রায়োগিক বেদান্ত বলতে বস্তুত কী বোঝায় এবং তা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কেন সেই ব্যাপারটিও পরিস্ফুট হতে পারবে না।

স্বভাবতই এ প্রসঙ্গে বেদান্ত দর্শন বলতে কী বোঝায় বা বেদান্ত দর্শনের মূল বক্তব্য কী অথবা বেদান্তের ব্যবহারিক প্রয়োগ বাস্তবিকই সম্ভবপর হয়েছিল কিনা বা বর্তমানে তা এই অতি-আধুনিক সময়ের প্রেক্ষিতে সত্যিই কতটা প্রাসঙ্গিক – ইত্যাদি দর্শন সংক্রান্ত এবং কিছু সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসাও হওয়া দরকার। সেই কারণে এই সমগ্র বিষয়াবলীর প্রতি মনোযোগ রেখে ই পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধটি রচনার প্রচেষ্টা করা হল। স্বামীজির ফলিত বেদান্ত বা নব্য-বেদান্তর ধারণার সঙ্গে তাঁর কর্মবাদের আদর্শ কীভাবে সম্পৃক্ত সেই সূত্রটিও এখানে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হল।

ভূমিকা

বাঙালির হৃদয়ের মাঝখানে স্বামী বিবেকানন্দের স্থান সদাই উজ্জ্বল, তাই তাঁর শৈশবকাল বা কৈশোরজীবন সম্বন্ধে মানুষের কৌতুহল এবং পরিচয় থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বিভিন্ন দার্শনিক বিষয়, আধ্যাত্মিক জগতের অনুসন্ধান, বিশেষত বৌদ্ধ দর্শন, বেদান্ত দর্শন, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বামীজির অসাধারণ পাণ্ডিত্য বা বুৎপত্তির কথা বিশদভাবে হয়ত অনেকেরই না জানা রয়ে গেছে। কলকাতা শহরের একটি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, আইনজীবী বিশ্বনাথ দত্ত এবং ভুবনেশ্বরী দেবীর ষষ্ঠ সন্তান ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁর প্রথম জীবনে নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। শৈশবকাল থেকে পারিবারিক শিক্ষার আবহে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, যুক্তি, বিজ্ঞান-এর পাশাপাশি ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মীয় বিদ্যার চর্চা নিতান্ত বালক বয়স থেকেই নরেন্দ্রনাথকে সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত উদার, স্বাধীন, বিশ্লেষণধর্মী, প্রগতিশীল এবং যুক্তিবাদী হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। স্কটিশচার্চ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ড. উইলিয়ম হেস্টি (Dr. William Hastiee) পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছিলেন, "Narendra is really a genius. I have travelled far and wide but I have never come across a led

of his talent and possibilities, even in German Universities, among philosophical students."

বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিক্ষার পাশাপাশি নরেন্দ্রনাথের মধ্যে অত্যন্ত বালক বয়স থেকেই লক্ষ করা গিয়েছিল এক অপূর্ব স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক টান বা আকর্ষণ। পথ চলতি সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি তার যেমন ছিল আগ্রহ, তেমনি তার সবচেয়ে প্রিয় খেলা ছিল 'ধ্যান-ধ্যান' খেলা।

যদিও স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যকাল আমাদের আলোচনার প্রত্যক্ষ বিষয় নয় তবুও একথাও মনে রাখা দরকার যে স্বামীজির জীবন সম্পূর্ণটাই ছিল শিক্ষণীয় এবং একথাও ঠিক যে মানুষের জীবনের প্রতিটি অংশ বা স্তরের মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা আছে, যা পরবর্তী জীবনে পরিণতি পেয়েছে তার বীজবপন অত্যন্ত অল্প বয়সেই সম্ভব। তাই স্বামীজির পরবর্তী জীবনের মতাদর্শ-ধ্যানধারণাকে সঠিকভাবে জানতে হলে তাঁর বালক বয়স বা কৈশোরের শখ-আহ্লাদ, পছন্দ, অনুরাগ বা আকর্ষণ সম্বন্ধেও ধারণা থাকা প্রয়োজন। কৈশোরে রাগপ্রধান সংগীত বা উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিমের সঙ্গে সঙ্গে ভজন, কুস্তি, লাঠিখেলা, সাঁতার, অভিনয় বা বিতর্কে অংশগ্রহণ ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস। এই সব কটি বিষয়ে তিনি অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এতেই শেষ নয়, নরেনের শিক্ষার ক্ষেত্র ছিল অতি ব্যাপক। বিভিন্ন ধরনের ভাষার চর্চা, সাহিত্যের চর্চা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভারতের প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থের চর্চা – এসবে নরেন্দ্রনাথের অতি আগ্রহ ছিল তা আমরা আগেই জেনেনি। তাছাড়াও তিনি একদিকে যেমন পড়তেন অ্যাস্ট্রোনমি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবিতা বা গল্প, অন্যদিকে আবার পড়তেন গিবন ও গ্রীণের ইতিহাস বই, জেভোন্সের ডিডাকটিভ লজিক, কান্ট, স্পেনসার বা মিলের দর্শন আবার কখনও অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্স। অত্যন্ত কিশোর বয়স থেকেই নরেন্দ্রনাথের মনে এক ধরনের দার্শনিক জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয় এবং সেই সমস্ত জিজ্ঞাসার মনের মতো উত্তরের জন্য কিশোর নরেন্দ্রনাথ উতলা হয়ে ওঠেন এবং তিনি অনুসন্ধান শুরু করেন। প্রায় বালক অবস্থা থেকেই যে আধ্যাত্ম অনুরাগের সূচনা সেই আকর্ষণ পরিপূর্ণতা পায় কৈশোর কালের শেষ অবস্থায় এসে এবং এইসময় থেকে নরেন্দ্রনাথ তার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নিয়মিত বিভিন্ন ধর্মীয় ও দর্শন সংক্রান্ত সভা-সমিতিতে যাতায়াত শুরু করেন। নিষ্ঠা সহকারে বিভিন্ন দার্শনিক পুস্তকের বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন। তিনি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন, আর্য সমাজ, থিওসোফিকাল সোসাইটির সভা বা ব্রাহ্ম সমাজের সভায় নিয়মিত শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকতে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জটিল দার্শনিক অনুসন্ধানের জন্য স্পেনসারের অজ্ঞেয়তাবাদ, হিউমের সংশয়বাদ, মিলের 'থ্রি এসেজ অন রিলিজিয়ন', শেলী ও হেগেলের দার্শনিক মতবাদের নিয়মিত পাঠক হিসেবে প্রবুদ্ধ হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর দার্শনিক জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর মিলছিল না, তিনি তাঁর দার্শনিক তৃষ্ণা নিবারমের সঠিক পথের সন্ধান লাভে অপারগ হয়ে থাকেন।

বস্তুতপক্ষে নরেন্দ্রনাথ দত্ত তথা স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বাংলা এবং সমগ্র ভারতবর্ষের একটি নতুন সময়ের সূচনাকার। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন অত্যন্ত আধুনিক, সৎ, দৃঢ়, নির্ভীক, তেজস্বী আবার অন্যদিকে ছিলেন জ্ঞানপিপাসু, সত্যানুসন্ধানী, আধ্যাত্মিক চেতনার অধিকারী বলিষ্ঠ চরিত্রের এক যুগপুরুষ। বারংবার তাঁর আধুনিক মনন তাঁকে নানান দার্শনিক প্রশ্নের সঠিক মীমাংসার জন্য অনুমানের সীমানা ছাড়িয়ে একেবারে প্রত্যক্ষ দর্শনের অঙ্গিকে এনে সমর্পিত করেছে আবার অন্যদিকে তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, সৎ বস্তু – ইত্যাদি আধ্যাত্ম বিষয়ের স্বরূপের অনুসন্ধানের প্রতি তাঁর মনকে প্রতিনিয়ত ব্যাকুল করে তুলেছে। বর্তমান আধুনিক বিশ্বের মানুষ, বিশেষ করে যুব সমাজ যেমন চোখের সামনে যা নেই, যাকে ধরা-ছোঁয়ার গণ্ডীর মধ্যে পাওয়া যায় না – তাকে সত্য বা real বলে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করে, সন্দেহ প্রকাশ করে বা কুণ্ঠাবোধ করে – আমরা বলতেই পারি স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এই আধুনিক যুব সমাজের সন্দিগ্ধ-সংশয়ী মননের অধিকারী, একেবারে অগ্রগামী

যুবক। ১৮৮১ সালে কলকাতার সুরেন মিত্রের বাসগৃহে নরেন্দ্রনাথ প্রথমবার শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাতে আসেন। যদিও প্রথম প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের দিন কোনো প্রশ্ন করেননি। ১৮৮২ সালে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাতের দিন নরেন্দ্রনাথ সরাসরি তাঁর সামনে দার্শনিক জিজ্ঞাসা উত্থাপন করেন। দ্বিতীয় সাক্ষাতের দিন নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছেন কি না, ঈশ্বরের দর্শন কি আদৌ সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জানালেন যে, অবশ্যই ঈশ্বরের দর্শন সম্ভব এবং তিনি তা লাভ করেছেন। তিনি নরেন্দ্রনাথকে বলেন যে, যেমনভাবে তাকে সামনে থেকে দেখেছেন তার চেয়েও স্পষ্টভাবে তিনি ঈশ্বরকে সামনে থেকে দর্শন করেছেন। নরেন্দ্রনাথ চাইলে তাকে তিনি সেই একই দর্শন করাতে প্রস্তুত। এই প্রথমবার এই প্রকার অকপট স্বীকারোক্তি নরেন্দ্রনাথের মনে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করল। এতদিন পর্যন্ত যুক্তি ও অনুমান নির্ভর সত্যানুসন্ধান ও লব্ধ তথ্যাবলি নরেন্দ্রনাথের সমস্ত গূঢ় জিজ্ঞাসার পরিপূর্ণ তৃষ্ণা নিবারণে সফল হয়নি বলাবাহুল্য। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ উপলব্ধিজাত প্রত্যক্ষ লব্ধ-সত্য সেই ১৮৮২ সালে সকল দার্শনিক অনুসন্ধানের সার্থক মীমাংসার সোপান তৈরি করল। সেই সময় থেকে সিদ্ধপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব হলেন নরেন্দ্রনাথের গুরু। যদিও নিজেকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করার পূর্বে শিষ্যত্ব স্বীকার করে নেওয়ার পূর্বে বহুবার নরেন্দ্রনাথ নানাভাবে তাঁর গুরুকে পরীক্ষা করেছেন কিন্তু প্রতিবারই শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ অথচ গভীর আধ্যাত্মবোধ, সততা, সারল্য, ত্যাগ ও পবিত্রতায় তিনি বিমুগ্ধ হন, অধীনতা স্বীকার করেন। এরপর থেকে একেবারে শেষ সময় পর্যন্ত বিবেকানন্দের সমস্ত দার্শনিক, ধর্মীয়, সামাজিক মতামত বা বক্তব্যের পশ্চাতে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। যদিও তিনি কখনও প্রকাশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের কোনও বাণী বা উক্তিকে সচেতনভাবে প্রচার করেননি — একথা স্বামীজির শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার রচনা থেকে আমরা জানতে পারি।

প্রায় ছয় বছর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যত্বে থাকাকালীন স্বামীজি নানা ধরনের আধ্যাত্মিক সত্যকে একেবারে কাছে থেকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। গভীর ধ্যানের মাধ্যমে তিনি সমাধি স্তরের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হন। শেষ পর্যন্ত তিনি ব্রহ্মকে অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তিনি এই সময়কালে ব্রহ্মের সাকার-নিরাকার তত্ত্ব, জগতের অসারতা, মায়াতত্ত্ব এবং সাক্ষী চৈতন্যের নিরাকার অদ্বয় তত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি দ্বারা বিবেকজ্ঞান ও বৈরাগ্যের অধিকারী হন। অর্থাৎ এইভাবেই নরেন্দ্রনাথ তাঁর ঈশ্বর-জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে খুঁজতে নিরাকার অদ্বয় ব্রহ্ম তত্ত্বে এসে উপনীত হন। সেখানে তাঁর আত্ম-চেতনা বা আত্ম-উপলব্ধি ঘটে। ১৮৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুরের বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন অর্থাৎ নবজন্মের পর তিনি নতুনভাবে বিবেকানন্দ রূপে প্রকাশিত হন। যদিও এই নতুন নামটির প্রবক্তার সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর শিষ্যকে জগতের রক্ষাকারী এক সৈনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ত্রিকালদর্শী এবং তিনি তাঁর শিষ্যকে নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা থেকে জাগ্রত অবস্থায় ফিরিয়ে এনে জীব প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। নরেন্দ্রনাথকে তিনি জগতের সেবার কাজে নিয়োজিত হতে আদেশ করেন। সমাজের প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি মানুষ যাতে অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে সেই সংকল্প নিয়ে বৃহত্তর সমাজের তথা দেশের সেবার কাজে নিযুক্ত হতে নির্দেশ দেন। শিবজ্ঞানে জীব সেবা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্র — যা তিনি তাঁর প্রিয়তম শিষ্যের মধ্যে প্রসারিত করতে পেরেছিলেন। অজ্ঞানতার অন্ধকারর থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ যেন নিজের ভেতরের অনন্ত নিরাকার চেতনা শক্তিকে উপলব্ধি করতে শিক্ষা লাভ করতে পারে নরেন্দ্রনাথও সেই লক্ষ্যে ব্রতী হন। গুরুর উপদেশ ছিল বিবেকানন্দের কাছে আদেশের নামান্তর, যা তিনি আমৃত্যু পালন করতে তৎপর ছিলেন।

ভারতবর্ষের নবজাগরণের পর্যায়ে একে একে আমরা অনেক মনীষীর পরিচয় পেয়ে থাকি; যাঁরা ছিলেন যুগের

Dum Dum Road

অবশ্যই। যেমন – একটি সামাজিক তথা ধর্মীয় আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে রাজা রামমোহন রায়, সাহিত্য আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং এরই প্রায় সমসাময়িক পর্যায়ে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৃহত্তর ভারতবর্ষের সামাজিক তথা ধর্মীয় আন্দোলনে যুক্ত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৃহত্তর ভারতবর্ষের সামাজিক তথা ধর্মীয় আন্দোলনে যুক্ত হলেন আরও অনেক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব যাদের মধ্যে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ ও মহাত্মা গান্ধীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নবজাগরণের কালে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একটি জ্বলন্ত আলোকপিণ্ডের মতো, যাঁর সর্ব শরীর থেকে একটি দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়ে চারপাশের পরিমণ্ডলে শান্তি, শক্তি ও আনন্দ বিতরণ করত। আধুনিক ভারতের রূপকার হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দর সবচেয়ে বড়ো অবদান হল Neo-Vedanta বা নব্য বেদান্ত, Practical Vedanta যাকে ব্যবহারিত বা ফলিত বা প্রায়োগিক বেদান্ত ইত্যাদি বিভিন্ন নামেই আলোচনা করা যায়। এই ব্যবহারিক বেদান্তের ভিত্তি ছিল মূলত মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। যদিও এই নতুন মুক্তির ধারণাটি, যাকে নব্য-বেদান্তের ভিত্তি বলা হয় তার শিক্ষা স্বামীজি লাভ করেছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছ থেকে। "The Philosophical base of this scheme is Neo-Vedanta, also called practical Vedanta, the basic element of which is a new conception of freedom. In the traditional Indian thought freedom is viewed as personal liberation or salvation. In a masterly way Vivekananda incorporated into it the Western idea of social and political liberty. Neo-Vedanta, therefore, stands for all-round freedom-physical and mental, material and psychological, as well as political and social." [২]

অতি প্রাচীন কালে ভারতের ধর্মীয় গ্রন্থে, শাস্ত্রে বা দর্শনে মোক্ষ বা মুক্তিকে একটি ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তথা স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের ব্যবহারিক প্রয়োগ বা নব্য বেদান্তের ব্যাখ্যার দ্বারা মোক্ষ বা মুক্তিকে ব্যক্তিগত জাগতিক পরিত্রাণের ধারণার গণ্ডী অতিক্রম করে একটি বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিয়ে এলেন। মোক্ষ বা মুক্তির অর্থ সেখানে আরও অনেক গভীর এবং পরিসরও অনেক ব্যাপ্ত। সেখানে মোক্ষ বা মুক্তির অর্থ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক বা জড় জগৎ থেকে মুক্তি – ইত্যাদি সর্বাঙ্গীণ মুক্তির কথাই বোঝানো হয়েছে। বস্তুত শুদ্ধ অদ্বৈত বেদান্তের মোক্ষের ধারণার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জগতের সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধারণাকে যুক্ত করেছিলেন যার ফলে মোক্ষ লাভের একটি আপাত কঠিন ধারণা খানিকটা সহজতর বোধগম্য হয়ে মানুষের চিরাচরিত মুক্তি বা স্বাধীনতার ধারণার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। স্বামীজি নিপুণভাবে তাঁর সুযোগ্য শিক্ষকতার দ্বারা যে নব্য-বেদান্তের প্রচার করেছিলেন সেটি নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে জানা প্রয়োজন বেদান্ত দর্শন কাকে বলে এবং এই বেদান্ত দর্শনের মূল বিষয়বস্তু কী।

বেদান্ত দর্শন কী? বেদান্তের সার বক্তব্য কী?

ভারতীয় চিন্তাধারার প্রাচীনতম গ্রন্থ হল বেদ। প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ ব্রহ্মাণ্ডে বহুর মধ্যে এক মূল বিশ্বশক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'এক সদ্‌বিপ্রা বহুধা কান্তি। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, জড়, চেতন, গ্রহ, উপগ্রহ সবকিছুই এক পরম পুরুষের অংশ।' [৩] সেই অনন্ত শক্তি বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে প্রকাশমান থাকে। বেদ হল সনাতন, বেদ হল সত্য ও নিত্য – বেদ হল স্বয়ম্ভু। এই বেদের অন্ত বা শেষ ভাগটিকেই 'বেদান্ত' বলা হয়। এটাই হল বেদান্ত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। প্রাচীনকালে বেদান্ত ও উপনিষদকে সমার্থক মনে করা হত এবং বেদান্ত বলতে প্রথমে উপনিষদকে বোঝায় এরকম ধারণা প্রচলিত ছিল যদিও পরবর্তী সময়ে ব্যাপক অর্থে উপনিষদীয় সমস্ত চিন্তাধারাকেই বেদান্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে। উপ-নি-সদ্ – উপনিষদ শব্দের অর্থ হল যা মানুষকে ব্রহ্মের

সামনে নিয়ে যায়। অন্যভাবে বলতে পারি ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য শিষ্য আচার্যের কাছে বসে যে শিক্ষা গ্রহণ করে। বৈদিক চিন্তাধারা বা বৈদিক ভাবনা ক্রমশ স্থূল থেকে সূক্ষ্ম এবং চরম সূক্ষ্মতম অবস্থায় উপনিষদে একটি পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করেছে। একই পরম সত্তার প্রকাশ জগতের সমস্ত কিছু। বিভিন্ন উপনিষদ এই পরম সত্তার দুটি দিক বর্ণনা করতে গিয়ে 'ব্রহ্ম' ও 'আত্মা' – এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছে। উপনিষদীয় দৃষ্টিতে আত্মাই হল ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হলেন বিষয়গত (Objective) জগতের অন্তরস্থ স্বরূপ। বস্তুত উপনিষদীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে একই পরম সত্তার প্রকাশ হল এই বিষয় এবং বিষয়ী। উপনিষদে আরও একটি প্রসঙ্গ রয়েছে। সেটি হল পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যার প্রসঙ্গ। পরাবিদ্যার বিষয় হল ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে জানা যায় যার দ্বারা সেই তত্ত্বই হল পরাবিদ্যা আর ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ সাপেক্ষ জ্ঞান হল অপরাবিদ্যা। বিভিন্ন বেদ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ছন্দ – ইত্যাদি বিষয় হল অপরাবিদ্যা। শ্রেয়কে লাভ করাই হল অপরাবিদ্যার লক্ষ্য। অপরদিকে পরাবিদ্যার লক্ষ্য হল শ্রেয়বস্তুকে অর্জন করা। ব্রহ্মানুভবই পরাবিদ্যা। পরাবিদ্যার সাহায্যে ব্রহ্মকে জানা যায়, লাভ করা যায়। ব্রহ্মানুভব একটি সাক্ষাৎ অনুভূতি।

উপনিষদে যে বেদ-ভাবনা সম্পূর্ণতা লাভ করেছে ঋক্, সংহিতা প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যে তাই রয়েছে একটি প্রচ্ছন্ন মোড়কে। তাই বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে বেদকেও উত্তম রূপে জানা প্রয়োজন। যদিও এখানে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। এখানে আমাদের চিন্তা ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল উপনিষদ তথা বেদান্ত। যে তত্ত্বজ্ঞানের উপর নির্ভর করে বিবেকানন্দ তাঁর নব্য-বেদান্ত ভাবনা গঠন করেছিলেন।

উপনিষদে আত্মা পরমতত্ত্ব রূপে চিহ্নিত হন এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লেখ করা হয় যে আত্মাকে জানা গেলেও কোনও কিছুই আর অজানা থাকে না। আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মা আনন্দ স্বরূপ বলে তাকে উপলব্ধি করতে পারলে সমস্ত কিছুই মধুময়, মুখরিত এবং আনন্দঘন হয়ে ওঠে। তত্ত্বজ্ঞান দান করার সময়ে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেন, মানুষের নিকট আত্মার চেয়ে প্রিয় এবং আপন কিছু নেই, তাই আত্মার কথা শোনা উচিত, আত্মার ধ্যান করা উচিত এবং আত্মাকেই জানার চেষ্টা করা উচিত। স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রাকালে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে আত্মা বিমল সমাহিত শান্তির রাজ্যে নিবিষ্ট হয়। আত্মার পাঁচটি আবরণ – অনুময়, প্রাণময়, মনময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। কেবলমাত্র সূক্ষ্ম চিত্তের অধিকারী ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন আবরণে ঢাকা আত্মার প্রকৃত পরিচয় জানা সম্ভব নয়। উপনিষদে আত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উপনিষদে আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অতীত একটি সর্বব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ। আত্মার বহিরঙ্গের বিভিন্ন আবরণ ভেদ করে যদি আত্মার উপলব্ধি লাভ করেন, আত্মার পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হন তিনি একটি চিরশান্তিময় এবং চির ঐশ্বর্যময় অবস্থা প্রাপ্ত হন। আত্মবিদ্যাই হল পরাবিদ্যা। উপনিষদ মতে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ চির আনন্দময় এই আত্মার অনুসন্ধানকে গুরুত্ব না দিয়ে মায়াময় জগতের অতি ক্ষণস্থায়ী সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সেই কারণেই আরও বেশি করে দুঃখের জটাজালে নিক্ষিপ্ত হয়। উপনিষদে শ্রেয় ও প্রেয়র মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। যা শ্রেয় তা কখনও প্রেয় নয়। এই দুটি পরস্পর বিরোধী আকর্ষণ মানুষকে আকৃষ্ট করে থাকে। শ্রেয় হল শুভ আর প্রেয় হল সুখের। যিনি প্রেয় লাভ করেন তার পরমার্থ আনন্দস্বরূপ থেকে বিচ্যুতি ঘটে আর যিনি শ্রেয় লাভ করেন তিনি চিরকল্যাণময় অবস্থার সন্ধান পান। বিষয়-আশয় সুখ যাকে প্রেয় বলা হয়েছে তার চেয়ে শ্রেয় অনেক উচ্চমার্গের। তা হল আনন্দস্বরূপ পরমচৈতন্যের উপলব্ধি।

"উপনিষদগুলিতে দুটি তত্ত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। একটি হল সপ্রপঞ্চতত্ত্ব, অন্যটি হল নিষ্প্রপঞ্চতত্ত্ব। *সপ্রপঞ্চতত্ত্বে ব্রহ্মের যথার্থ পরিণাম হল জীব – এরকম বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে ব্রহ্ম জগতে অন্তর্লীন। নিষ্প্রপঞ্চতত্ত্বে জীব ব্রহ্মের বিবর্ত বলা হয়েছে। অবিদ্যাই এ বিবর্তের হেতু। আরও বলা হয়েছে ব্রহ্ম জগতের অতিরিক্ত।*"[৪] আচার্য বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র' বহু উপনিষদগুলির বিভিন্ন বক্তব্যের একটি যুক্তিসম্মত সমন্বয় রূপ।

এটি উপনিষদের বহুবিধ শ্লোক বা ব্যাখ্যার অন্তর্নিহিত অর্থ বিশ্লেষণের একটি কঠিন প্রয়াস। এই মহর্ষি বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র'কে কেন্দ্র করে শঙ্করাচার্যের বেদান্ত মত যা 'কেবলাদ্বৈতবাদ' বা 'অদ্বৈতবাদ' নামে এবং রামানুজের বেদান্ত মত যা 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ব্রহ্মই বেদান্ত দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং বাদরায়ণ তাঁর ব্রহ্মসূত্রে সুস্পষ্টভাবেই 'অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ' প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শঙ্কর ও রামানুজ দুজনেই অদ্বৈতবাদী। এঁরা দুজনেই বাদরায়ণের অদ্বৈতবাদের অনুগামী। অদ্বৈতবাদ সর্বব্যাপী একটি পরমতত্ত্বে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আর সেটি হল "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বা 'এক' ছাড়া দুই এর কোনও অস্তিত্ব নেই। শঙ্কর ও রামানুজ – এঁদের দুজনের মতবাদ বেদান্ত সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও দুটি মতবাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। অপরপক্ষে রামানুজের মতে অংশের সঙ্গে অংশীর সম্পর্ক যেমন, জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্কও ঠিক তেমন। শঙ্করের মতবাদে যুক্তি-তর্ক ও জ্ঞান প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে রামানুজের মতবাদে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির একটি সমন্বিত ভাব প্রাধান্য পেয়েছে অধিক। নামকরণের দিক থেকে আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ হল কেবল দ্বৈতবাদ এবং রামানুজের অদ্বৈতবাদ হল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। শঙ্করের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। আত্মাই হল ব্রহ্ম। উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' বাক্যে জীবাত্মা-পরমাত্মা যে অভিন্ন – এরই ঘোষণা করা হয়েছে। 'তৎ' অর্থাৎ 'সেই' ব্রহ্ম বা সেই চৈতন্য রূপ পরমাত্মা। 'ত্বম্' অর্থাৎ 'তুমি' বা জীব বা তোমার অন্তর্নিহিত জীবাত্মা। যার নিহিতার্থ হল – 'তুমিই সেই, সেই তুমি'। শঙ্করাচার্য মনে করেছেন মুক্তিকামী ব্যক্তিকে আত্মজ্ঞান লাভ করতে গেলে বা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারী হতে গেলে চতুর্বিদ অভ্যাস সাধনা করতে হবে। চতুর্বিধ সাধনায় অধিকারী হলে সিদ্ধ ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কাছে গিয়ে 'তত্ত্বমসি' গভীরে আত্ম নিমজ্জন করবেন। শ্রবণ মনন-নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে 'তত্ত্বমসি'র আলোয় সমস্ত অজ্ঞান দূরীভূত হবে। তিনি উপলব্ধি করতেন 'সোহম্' বা 'আমিই সে' – আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবে।

অপরদিকে আচার্য রামানুজের মতে ব্রহ্ম সনাতন ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্মই এক পরমতত্ত্ব, যা চিৎ অচিৎ-এর বিশিষ্ট ঐক্য প্রকাশ করে। ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সক্রিয় ও করুণাময়। ব্রহ্ম অপরিমেয় সদ্‌গুণের অধিকারী। রামানুজ ব্রহ্মের স্বগতভেদ স্বীকার করেন, কারণ ব্রহ্মের অভ্যন্তরে চিৎ ও অচিৎ বিদ্যামান, এই দুই অংশের মধ্যে ভেদও বর্তমান। কিন্তু রামানুজ ব্রহ্মের সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ স্বীকার করেন না কারণ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। ব্রহ্মে বিজাতীয় ভেদ নেই কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নেই। রামানুজ শঙ্করের মতো এই জগৎকে মায়াময় বলেন না। শঙ্করের মতে এ জগৎ মায়ার সৃষ্টি। মায়া হল অবিদ্যা যা ব্রহ্মকে আবৃত করে রাখে। কিন্তু রামানুজ মনে করেন ব্রহ্মের সৃষ্টির কাজ যেমন সত্য, তাঁর সৃষ্ট জগৎও ঠিক তেমনি সত্য। উভয়ের কোনটিই মায়া নয়।

বেদান্তের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে স্বামীজির মত

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগোয় যে ধর্ম-মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা তাঁকে এবং ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চেতনার মূল ভাবনাটিকে বিশ্বের দরবারে একটি বিশেষ আসন প্রদান করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, হিন্দুদের ধর্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত ধারণা আছে সেই সমস্ত ধারণাই ছিল বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার বিষয়। "ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজ করেন – হিন্দুগণের এই যে বিশ্বাস, তাহারই প্রচারক রূপে স্বামীজি আমাদের দেশে আসিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্মের (gospel) সত্যতা নির্ণয়ের জন্য তিনি সকলকে উহা পরীক্ষা করিয়া লইতে আহ্বান করেন। তখনই বা কি, আর পরেই বা কি, আমি তাঁহাকে কখনও শ্রোতৃবর্গের নিকট উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে গিয়া তিনি অসঙ্কোচে ভারতের

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (sects) উল্লেখ করিতেন – উহাদিগকে 'সম্প্রদায়' না বলিয়া বিভিন্ন ধর্মমত (churches) বলিলেই ভাল হয়। কিন্তু ভারতীয় চিন্তা প্রণালীতে যে দর্শন সমুদয় ধর্মমতের ভিত্তিস্বরূপ, তাহা ব্যতীত তিনি অপর কিছু কখনও প্রচার করেন নাই। বেদ, উপনিষদ ও ভাগবদগীতা ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থ হইতে কখনও কোন অংশ উদ্ধৃত করেন নাই। জনসমক্ষে তিনি কখনও তাঁহার গুরুত্বের উল্লেখ করেন নাই, অথবা হিন্দু পৌরাণিক আখ্যান সমূহের অর্থবিশেষ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট মতামতও প্রকাশ করেন নাই।"[৩]

ভগিনী নিবেদিতার এই মতামতের ওপর দৃষ্টিপাত করলে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতার কেন্দ্রে স্থান দিয়েছিলেন বেদ, উপনিষদ এবং ভাগবদগীতাকে কিন্তু তিনি কেবলমাত্র বক্তৃতা দেওয়াতেই আলোচনার সমাপ্তি মনে করেননি। তিনি এমনই মনে করেছিলেন যে ধর্মের আলোচনাতেই তার সার্থকতা পূরণ হয় না, হৃদয় দিয়ে এই সারসত্যকে গ্রহণ করা এবং জীবনে তাকে পালন করার মধ্যেই তার সার্থকতা। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ যে নতুন মতবাদটিকে সম্মুখে নিয়ে এসেছিলেন সেটা হল Neo-Vedanta বা Practical-Vedanta অর্থাৎ ফলিত বেদান্ত বা ব্যবহারিক বেদান্ত। এর প্রকৃত অর্থ হল বেদান্তের সার-সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করে এবং আত্তীকরণ করে সেই উপলব্ধিকে নিজের এবং বৃহত্তর সমাজের মঙ্গলের স্বার্থে উজাড় করে দেওয়া। বেদান্তের এই নতুন ভাবনার বা নব্য বেদান্তের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নব্য-বেদান্তের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল – সার্বজনীনতা, নীতিনিষ্ঠতা, যৌক্তিকতা, উদারতা বা সার্থকতা ইত্যাদি। "Naturally, the Neo-Vedantic movement is also called Ramkrishna-Vivekananda movement. This Neo-Vedanta or Practical Vedanta, according to Sarma, has five characteristic features : (i) Universality, (ii) impersonality, (iii) rationality, (iv) catholicity, and (v) optimism."[৪]

স্বামীজি মনে করতেন, ধর্ম হল একটি এমন বিষয় যা প্রত্যক্ষ করতে হবে অর্থাৎ স্বামীজির কাছে প্রত্যক্ষ করা বা প্রত্যক্ষানুভূতি (realization) এর গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত বেশি। আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেও তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায় কিনা বা ঈশ্বর কোনও প্রত্যক্ষের বিষয় কিনা। ভগিনী নিবেদিতা নিজের গুরু স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে রচিত গ্রন্থে একথাই বলেছেন যে, স্বামীজি সম্ভবত কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান – এই তিনটিকে আত্মজ্ঞান লাভের তিনটি উপায় বলে মনে করতেন। মানুষের অন্তরের অনন্ত শক্তি নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে স্বামীজি একথা বলেছিলেন যে, ত্যাগই একমাত্র পথ – এটিই সমস্ত ধর্মের একমাত্র শিক্ষা বা মূল বক্তব্য। স্বামীজি মনে করেছিলেন মানুষ যে ঈশ্বরকে সর্বত্র খুঁজে বেড়ায় তার কারণ হল পূর্ণ আদর্শ মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে তাই বাইরে নয়, নিজের ভেতরেই ঈশ্বরের অনুসন্ধান করতে হবে। এদিক-ওদিকে, মন্দিরে, চার্চে, স্বর্গে-মর্ত্যে নানা জায়গায় নানারকমভাবে সুদীর্ঘ অন্বেষণের পর মানুষ যেখান থেকে তার এই যাত্রার সূচনা করেছিল অর্থাৎ সেই আত্মাতেই বৃত্তাকার পথ পরিক্রমা করে এসে দাঁড়ায়। স্বামীজি মনে করতেন পূর্ণতার জন্য সহকর মানুষের শোভা পায় না কারণ মানুষ প্রথম থেকেই পূর্ণস্বরূপ। নিজের পূর্ণতার আভাস তার থাকে না কারণ সে চোখে অজ্ঞানের একটি ঠুলি পরে থাকে তাই প্রকৃতি এই সত্যকে পর্দার আড়ালে আবৃত করে রাখে। এই আবরণ সৃষ্টিকর্ত্রী প্রকৃতি হল ছলনাময়, মায়া বা অজ্ঞান। যখনই কেউ সৎ আচরণ করেন, সৎ চিন্তা করেন, সৎ কর্ম করেন বা প্রকৃত জ্ঞানী হয়ে ওঠেন তখনই এই মায়ার আবরণ অল্প অল্প করে সরে যেতে থাকে এবং জগতের চরম অসারতাকে উন্মোচিত করতে থাকে। অজ্ঞান বা মায়ার আবরণ সম্পূর্ণ সরে গেলে সেই আবরণের অন্তরালে ঢাকা পড়ে থাকা অনন্ত স্বরূপ অসীম আত্মা স্বমহিমায় নিজেকে প্রকাশ করেন। তখন মানুষ বাস্তবে নিজের স্বরূপকে জানতে সক্ষম

হয়, সমস্ত অন্ধকার যায় ঘুচে। বেদান্তের এই সর্বশক্তিময় সত্যকে উন্মোচিত করে স্বামীজি বলেন, দুর্বলতাই হল সংসারের সমস্ত দুঃখের কারণ। মানুষ দুর্বল হয় বলেই সে নানা পাপকর্মে নিজেকে নিযুক্ত করে – চুরি, ডাকাতি, ভ্রষ্টাচার, জুয়াখেলা ইত্যাদি নীচ কর্মে সে নিযুক্ত হয়। অজ্ঞানের আবরণের কারণে নিজের অন্তরের সত্যকে উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয় বলেই মানুষ নিজেকে অসহায়, দুর্বল, শক্তিহীন, বদ্ধ ও ক্ষুদ্র বলে মনে করে থাকে এবং নিরর্থক চিন্তার দ্বারা ক্রমাগত নিজেকে আরও পাপের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অজ্ঞানকে দূরীভূত করতে হবে প্রকৃত জ্ঞান দিয়ে। কিন্তু অনেক সময় মনে করা হয় যে জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল জ্ঞান আহরণের কাজে জীবন অতিবাহিত করেন বলে হয়ত জগতের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত সুকর্ম আর করা হয়ে ওঠে না। স্বামীজি বলেন, জ্ঞানী হতে গেলেই যে স্বার্থপর হতে হবে – একথারও কোনও ভিত্তি নেই। উচ্চতর দার্শনিক বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগী বা নিঃস্বার্থের যে সর্বোচ্চ আদর্শ তার কোনও বিরোধ নেই। নীতিপরায়ণ স্বার্থত্যাগী হতে গেলেই যে প্রকৃত জ্ঞান, ধর্মজ্ঞান বা দার্শনিক জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করতে হবে – এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল। বরং দুটিকেই দুটির শক্তি হতে হবে। নীতির প্রকাশ পায় কর্মে তাই কল্যাণকর্মের দ্বারা জগতে সুকর্ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে তেমনি আবার নীতিকে বলিষ্ঠ ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাকে উচ্চতর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠা করাই প্রয়োজন। প্রকৃত জ্ঞান কখনও প্রকৃত কল্যাণের বিরোধী হতে পারে না কারণ দুটির উদ্দেশ্যই এক মুখী – জগতের সেবা। অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত হতে হলে জ্ঞানই একমাত্র পাথেয়। জ্ঞান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের রক্ষা করে তাই জ্ঞানই হল প্রকৃত উপাসনা। বেদান্তের শিক্ষা হল – অজ্ঞান, অশুভ, অসত্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কোনও অতিপ্রাকৃত বা অপ্রাকৃত সত্তাকে দোষারোপ করা যেমন অমূলক তেমনি বাইরের জগতের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করাও অমূলক। এই সাহায্য আসবে নিজেরই অন্তরাল থেকে, ভেতরের ঘুমন্ত শক্তি একদিন জাগবে এবং সমস্ত দুর্বলতাকে ছিন্ন করে উন্মুক্ত হবে। জীবনে সঠিক-এর প্রয়োজন আছে তেমনি বেঠিক বা ভুলেরও প্রয়োজন আছে। স্বামীজি বলেছেন, আমাদের জীবনের ভালো বা মন্দ, ঠিক বা বেঠিক – কোনও ভাবই শেষপর্যন্ত বৃথা যায় না। বর্তমানের এই আমি বা আমরা হলাম জীবনের সমস্ত শুভ বা অশুভ, ঠিক বা বেঠিকেরই ফলাফল। জীবনে যে যে কর্ম ভুল হয়েছে তার একটিও ভুল কর্ম কম হলে হয়ত এই আমরা আর আজকের 'আমি' হতাম না। একথার মাধ্যমে স্বামীজি বস্তুত পক্ষে বলতে চেয়েছেন যে কিছু কর্ম ভুল হয়ে গেছে বলে কখনই পথ চলা থামিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সমস্ত কর্ম একদিন সঠিক, শুভ, পবিত্র ধারায় এসে মিলিত হবে – মনে এই বিশ্বাস স্থির রাখা উচিত। মানুব স্বভাবত সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং সাধু। তাই কখনও কোনও ভুল কর্ম ঘটে গেলেও মানুষের পবিত্রতা, সাধুতা বা সততা তাতে বিনষ্ট হয় না, তা ঠিকই একদিন নিজেকে উন্মুক্ত করবে। স্বামীজি বলেন, বেদান্ত কখনো মানুষের দুর্বল দিকটিকে বড়ো করে দেখায় না বরং মানুষের মধ্যে যে শক্তি একেবারে পূর্ব অবস্থা থেকেই বিদ্যমান বেদান্ত তাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষের ভেতরের দুর্বলতাকে নিয়ে সর্বদা আলোচনা করা সেই দুর্বলতাকে প্রতিকার করার উপায় নয় বরং মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, ভেতরের অনন্ত শক্তির সন্ধান লাভের দ্বারা নিজের আত্মিক এবং বহিরঙ্গের পূর্ণ উন্নতি – এটিই বেদান্তের শিক্ষা।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, জগতে দুটি শক্তি সর্বদা সমান্তরালভাবে ক্রিয়াশীল। একটি হল 'অহং' অর্থাৎ 'আমি' আর একটি হল 'নাহং' বা 'আমি নই'। এই দুটি সমান্তরাল কিন্তু বিপরীত ধারার শক্তি মানুষ থেকে শুরু করে জীবজন্তু এমনকি ক্ষুদ্রতম কীটাণুর মধ্যেও বিরাজমান। এই মানুষ কখনো চরম স্বার্থপর আবার কখনো অসম্ভব স্নেহশীল বা ভীষণ রকম পরোপকারী। কোনও বাঘিনী তার শাবকদের রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে আবার সেই প্রাণ রক্ষার জন্য মুহূর্তে হরিণ শিকারে প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ, জগতের সর্বত্র সর্বকালে ত্যাগ এবং ভোগ, স্বার্থহীনতা

হয়, সমস্ত অন্ধকার যায় ঘুচে। বেদান্তের এই সর্বশক্তিময় সত্যকে উন্মোচিত করে স্বামীজি বলেন, দুর্বলতাই হল সংসারের সমস্ত দুঃখের কারণ। মানুষ দুর্বল হয় বলেই সে নানা পাপকর্মে নিজেকে নিযুক্ত করে – চুরি, ডাকাতি, মিথ্যাচার, জুয়াখেলা ইত্যাদি নীচ কর্মে সে নিযুক্ত হয়। অজ্ঞানের আবরণের কারণে নিজের অন্তরের সত্যকে উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয় বলেই মানুষ নিজেকে অসহায়, দুর্বল, শক্তিহীন, বদ্ধ ও ক্ষুদ্র বলে মনে করে থাকে এবং নঞর্থক চিন্তার দ্বারা ক্রমাগত নিজেকে আরও পাপের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অজ্ঞানকে দূরীভূত করতে হবে প্রকৃত জ্ঞান দিয়ে। কিন্তু অনেক সময় মনে করা হয় যে জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল জ্ঞান আহরণের কাজে জীবন অতিবাহিত করেন বলে হয়ত জগতের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত সুকর্ম আর করা হয়ে ওঠে না। স্বামীজি বলেন, জ্ঞানী হতে গেলেই যে স্বার্থপর হতে হবে – একথারও কোনও ভিত্তি নেই। উচ্চতর দার্শনিক বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগী বা নিঃস্বার্থের যে সর্বোচ্চ আদর্শ তার কোনও বিরোধ নেই। নীতিপরায়ণ স্বার্থত্যাগী হতে গেলেই যে প্রকৃত জ্ঞান, ধর্মজ্ঞান বা দার্শনিক জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করতে হবে – এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল। বরং দুটিকেই দুটির শক্তি হতে হবে। নীতির প্রকাশ পায় কর্মে তাই কল্যাণকর্মের দ্বারা জগতে সুকর্ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে তেমনি আবার নীতিকে বলিষ্ঠ ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাকে উচ্চতর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠা করাই প্রয়োজন। প্রকৃত জ্ঞান কখনও প্রকৃত কল্যাণের বিরোধী হতে পারে না কারণ দুটির উদ্দেশ্যই এক মুখী – জগতের সেবা। অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত হতে হলে জ্ঞানই একমাত্র পাথেয়। জ্ঞান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের রক্ষা করে তাই জ্ঞানই হল প্রকৃত উপাসনা। বেদান্তের শিক্ষা হল – অজ্ঞান, অশুভ, অসত্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কোনও অতিপ্রাকৃত বা অপ্রাকৃত সত্তাকে দোষারোপ করা যেমন অমূলক তেমনি বাইরের জগতের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করাও অমূলক। এই সাহায্য আসবে নিজেরই অন্তরাল থেকে, ভেতরের ঘুমন্ত শক্তি একদিন জাগবে এবং সমস্ত দুর্বলতাকে ছিন্ন করে উন্মুক্ত হবে। জীবনে সঠিক-এর প্রয়োজন আছে তেমনি বেঠিক বা ভুলেরও প্রয়োজন আছে। স্বামীজি বলেছেন, আমাদের জীবনের ভালো বা মন্দ, ঠিক বা বেঠিক – কোনও ভাবই শেষপর্যন্ত বৃথা যায় না। বর্তমানের এই আমি বা আমরা হলাম জীবনের সমস্ত শুভ বা অশুভ, ঠিক বা বেঠিকেরই ফলাফল। জীবনে যে যে কর্ম ভুল হয়েছে তার একটিও ভুল কর্ম কম হলে হয়ত এই আমরা আর আজকের 'আমি' হতাম না। একথার মাধ্যমে স্বামীজি বস্তুত পক্ষে বলতে চেয়েছেন যে কিছু কর্ম ভুল হয়ে গেছে বলে কখনই পথ চলা থামিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সমস্ত কর্ম একদিন সঠিক, শুভ, পবিত্র ধারায় এসে মিলিত হবে – মনে এই বিশ্বাস স্থির রাখা উচিত। মানুষ স্বভাবত সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং সাধু। তাই কখনও কোনও ভুল কর্ম ঘটে গেলেও মানুষের পবিত্রতা, সাধুতা বা সততা তাতে বিনষ্ট হয় না, তা ঠিকই একদিন নিজেকে উন্মুক্ত করবে। স্বামীজি বলেন, বেদান্ত কখনো মানুষের দুর্বল দিকটিকে বড়ো করে দেখায় না বরং মানুষের মধ্যে যে শক্তি একেবারে পূর্ব অবস্থা থেকেই বিদ্যমান বেদান্ত তাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষের ভেতরের দুর্বলতাকে নিয়ে সর্বদা আলোচনা করা সেই দুর্বলতাকে প্রতিকার করার উপায় নয় বরং মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, ভেতরের অনন্ত শক্তির সন্ধান লাভের দ্বারা নিজের আত্মিক এবং বহিরঙ্গের পূর্ণ উন্নতি – এটিই বেদান্তের শিক্ষা।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, জগতে দুটি শক্তি সর্বদা সমান্তরালভাবে ক্রিয়াশীল। একটি হল 'অহং' অর্থাৎ 'আমি' আর একটি হল 'নাহং' বা 'আমি নই'। এই দুটি সমান্তরাল কিন্তু বিপরীত ধারার শক্তি মানুষ থেকে শুরু করে জীবজন্তু এমনকি ক্ষুদ্রতম কীটাণুর মধ্যেও বিরাজমান। এই মানুষ কখনো চরম স্বার্থপর আবার কখনো অসম্ভব স্নেহশীল বা ভীষণ রকম পরোপকারী। কোনও বাঘিনী তার শাবকদের রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে আবার সেই প্রাণ রক্ষার জন্য মুহূর্তে হরিণ শিকারে প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ, জগতের সর্বত্র সর্বকালে ত্যাগ এবং ভোগ, স্বার্থহীনতা

এবং স্বার্থপরতা, বর্জন এবং গ্রহণ – এই দুটি বিপরীতমুখী ক্রিয়ার যুগপৎ অবস্থান। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে – জগতের সমস্ত কর্মচাঞ্চল্য কি এই হিংসা-দ্বেষ-স্বার্থহীনতা—ভোগ এবং প্রতিযোগিতার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর ব্যাখ্যায় স্বামীজি বলেন, জগতে যে অহংকার, ভোগ, লালসা বা স্বার্থপরতার প্রকাশ দেখা যায় তা আসলে প্রেম শক্তিরই অপপ্রয়োগের ফল। অশুভ বলে যা কিছুকে আমরা দেখতে পাই তা আসলে শুভশক্তিরই ভুল পথে প্রকাশিত রূপ। কোনও মানুষ বা জীবজন্তুর প্রেম-ভালোবাসা যখন সমগ্র বিশ্বের প্রতি অনুভূত না হয়ে কেবলমাত্র তার নিকটাত্মীয়দের প্রতি অনুভূত হয় – তখন অনুভবের সেই সীমাবদ্ধতাই তাকে অন্যের সঙ্গে স্বার্থপরতা বা হীনতা করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। এই প্রেম যখনই তার দিশা বদল করে উল্টোমুখী হয়ে সমগ্র বিশ্বের দিকে দাবমান হবে তখনই তা সমগ্রত্বের রূপ পরিগ্রহ করে বিশ্বপ্রেমে পরিণত হবে, যেখানে নঞর্থক অনুভব আর থাকবে না।

অদ্বৈতবাদের দ্বারা ব্যবহারিক নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজি আরও বলেছেন, গীতার শ্লোক অনুসারে যিনি সমদর্শী তিনি ঈশ্বরকে সর্বত্র সমানভাবে অবস্থিত দেখতে সমর্থ, তাই তিনি অন্যকে হিংসা করেন না বা অন্যের ক্ষতি করার কথা চিন্তা করেন না। কারণ তিনি অনুধাবন করেছেন যে, অন্যকে হিংসা করা বস্তুতপক্ষে নিজেকেই হিংসা করা। অদ্বৈতবাদের শিক্ষা হল অন্যের ক্ষতি করতে গিয়ে মানুষ আসলে নিজেরই ক্ষতি সাধন করতে চায়। আসলে সকল 'অন্য'ই যে সে নিজে এ-বোধ তৈরি হওয়ার জন্য অজ্ঞানকে দূরীভূত করার প্রয়োজন। যে মানুষ উঁচু অট্টালিকার আরামে শয়ন করছে আর যে মানুষ পথে প্রান্তরে খোলা আকাশের নীচে শয়ন করছে তাদের মধ্যে বস্তুত কোনও অমিল নেই, তারা সকলেই আসলে একজনই। তারা সবাই আসলে আমি। অমিল কেবল বাহ্য অঙ্গের, চেতনা বা চৈতন্যে কোনও অমিল নেই। বেদান্তের মূল ভাব হল এই যে, আমরা সকলে এক একটি প্রণালী (Channel) এর মতো যার মধ্যে সে অসীম সত্তা নিজেকে অভিব্যক্ত করেছেন। 'জগতের ব্রহ্মভাব' কে জানা আসলে নিজেকেই উন্মোচিত করা যার মধ্য দিয়ে দুঃখময় আপাত জগতের আনন্দময় রূপটিকে অন্তরে উপলব্ধি করতে হয়। বেদান্ত দর্শন মানুষের জীবনে বৈরাগ্যকে সমর্থন জানায় কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বলেন সেই বৈরাগ্য জগৎ বিমুখ বৈরাগ্য নয়। সাধন-ভজন এবং তার সঙ্গে সঠিক কর্মপালন অর্থাৎ জীবসেবা – এই হল প্রকৃত বৈরাগ্য বা ধর্ম পালন। অসীম পরার্থপরতা, দয়া, মায়া, পবিত্রতা সহ নীতিপরায়ণ চিত্তে কেউ যখন জীবসেবায় ব্রতী হয় বা সংসারের মাঝে নিজেকে উজাড় করে দিতে সমর্থ হয় আর তাতেই জীবনের সমস্ত আনন্দ আস্বাদন করতে সমর্থ হয় তখন সেটাই হল প্রকৃত মানবধর্ম, পূজা বা ঈশ্বরপ্রেম। জগতের সর্বত্র ঈশ্বর বিরাজমান – এই মূলমন্ত্রকে সর্বদা স্মরণ করে মানবতার ধর্ম পালনের মধ্য দিয়েই আসে মুক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ এইভাবে একদিকে বেদান্তের নীতি এবং অন্যদিকে কর্মের মধ্য দিয়ে তার ফলিত রূপটিকে ব্যাখ্যা করে সমগ্র ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীতে সত্য-শিব ও সুন্দরের অভিমুখে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন।

উপসংহার

স্বামী বিবেকানন্দের অমর বাণী হল, 'জীবে প্রেম করে যেন জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' – যা সমগ্র ভারতবাসীর কাছেই অতি পরিচিত কিছু শব্দবন্ধ। তবে এই আপাত অশান্ত, নিস্তরঙ্গ একটি বাক্যের মধ্যে নব্য-বেদান্তের যে-কটি বৈশিষ্ট্য, যেমন – সার্বজনীনতা, উদারতা, যুক্তিবোধ, নীতিনিষ্ঠতা বা সার্থকতা সবেরই প্রকাশ রয়েছে সেই দিকটা হয়ত সকলের বোধের বাইরে থেকে যায়। প্রতিটি জীবকে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অবস্থান অনুভব করে, সবাইকে সমান চোখে দেখার এবং সমানভাবে সেবা করার কথা বলে স্বামীজি বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে আপাত সংকীর্ণতার গণ্ডী রয়েছে তাকে অতিক্রম করে যান। আসলে প্রতিটি ধর্মই যে মানবতার বাণী প্রচার করে তিনি সেই

জীবের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেন। অন্যের নিঃস্বার্থ সেবার মধ্যে যে ত্যাগ ও পরোপকার থাকে সেটা পালন করাই হল মানবধর্ম, যা বেদান্তের 'সো অহম্ ব্রহ্ম' বা 'তত্ত্বমসি' বাক্য থেকেই উদ্গত – এই ছিল স্বামীজির শিক্ষা। মানবসেবা বা জীবসেবা কেন জীবনের ধর্ম হওয়া উচিত তা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেও দেখানো যায় যে প্রতিটি জীবই আসলে 'আমি', তাই অন্যের সেবার দ্বারা আসলে আমি আমারই উপকার করছি, নিজেরই মুক্তির পথ প্রস্তুত করছি। ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন কর্ম, ভগবদ্গীতায় যা নিষ্কাম কর্ম – সাধনভজন সমেত সেই কর্ম সম্পাদন করতে পারলে মানুষের মুক্তি লাভ হয়। নিষ্কাম কর্ম সাধনের প্রাথমিক ভিত হল প্রতিটি জীবের মধ্যে ঈশ্বরের উপলব্ধি এবং নিজের উপলব্ধির ওপর স্থির বিশ্বাস স্থাপন। পৃথিবীর যে কোনও ধর্মের সার কথা হল জীবসেবা, সংসারের সকলের মঙ্গল এর বাইরে আর কিছু না – এটিই হল বিবেকানন্দের মত।

প্রথমত, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং পরবর্তী স্বামী বিবেকানন্দের এই নব্য বেদান্ত বা ফলিত বেদান্তের বাণী যতটা না ছিল ধর্মীয় তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল নৈতিক এবং সামাজিক। বস্তুতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, যা মূলত ছিল অদ্বৈত বেদান্তের ফলিত বা ব্যবহারিক প্রয়োগ সংক্রান্ত বাণী বা উপদেশাবলি, যা কোনও সময়েই কোনও ধর্মীয় মহান্ত প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি, বরং হয়েছিল সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে। সমাজের পিছিয়ে পড়া, দুঃস্থ, অসহায়, সর্বহারা মানুষকেও যে 'আমার রক্ত, আমার ভাই' বলে বুকে টেনে নিতে হবে – এই শিক্ষাই স্বামীজি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন আর তার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন অদ্বৈত বেদান্তের 'তত্ত্বমসি'র চেতনাকে। যুক্তিহীন অন্ধ ধর্মীয় আবেগ থেকে সরে এসে যুক্তিপূর্ণ ক্ষুরধার সত্য দিয়ে ধনী-নির্ধন, উচ্চ বংশ-নীচ বংশ যুক্ত সকল মানুষের মধ্যে একই পূর্ণসত্তার অধিষ্ঠানের কথা দৃঢ়তার সঙ্গে স্থাপনা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মীয় সহমতির চেতনা এবং নব্য বেদান্তের আরও একটি প্রকাশ মাত্র যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় চেতনা যুক্ত মানুষ সমগ্র সমাজের হিত কামনা করবে এবং সেই হিতের জন্য সচেষ্টও হবে। আর্তের সেবার চেয়ে বৃহৎ কোনও ধর্মীয় কর্ম নেই। ঈশ্বর যেমন প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় ধর্মও তাই। মানবকল্যাণের মধ্য দিয়ে এই দুয়েরই সেবা সম্ভব। বৃহত্তর সমাজ কল্যাণের থেকে পৃথকভাবে কোনও পূজা, উপাসনা বা ধর্মীয়ভাব প্রতিষ্ঠা হলে তা হবে অসার ও অর্থহীন। যে দেখে, যে সমাজে, যে রাষ্ট্রে প্রতিটি জীব, প্রতিটি প্রাণী সুখে শান্তিতে নিজের পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকারী হতে পারে তাই আসলে প্রকৃত উন্নতিশীল সমাজ। ঈশ্বরের চিন্তায় নিজেকে সমাজ থেকে পৃথক করা নয় বরং সমাজের সেবক হিসেবে উচ্চতর নৈতিক কর্মের দ্বারা ঈশ্বরের নিকটস্থ হওয়ার সাধনাই কাম্য। মানুষের সেবা, মানুষের কল্যাণ বা মানুষের দুর্দশা মুক্তির চেষ্টা – এর বাইরে কোনও ধর্মীয় গ্রন্থ, কোনও নীতিতত্ত্বের পুস্তক বা কোনও দার্শনিক-আধ্যাত্ম তত্ত্ব নিদান দিতে পারে না।

তথ্যসূত্র

১) Panigrahi, Umapada, (2016), *Outline of the History of Sociological Theory and Thought : Western and Indian*, Kalyani Publishers, Ludhiana, p. 340

২) Mukherji, Santi L. (2008), *The Philosophy of Man-Making : A Study in Social and Political Ideas of Swami Vivekananda*, New Central Book Agency (P) Ltd., Kolkata, Second Edition, p. 51

৩) সাঁতরা, অরুণকুমার, 'ভারতীয় দর্শন', অভিনব প্রকাশন, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৫, পৃ. ২৭১।

৪) সাঁতরা, অরুণকুমার, 'প্রাগুক্ত গ্রন্থ', পৃ. ২৭৮

৫) ভগিনী নিবেদিতা, 'স্বামীজীকে যে রূপ দেখিয়াছি', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭৫, পৃ. ১১।

৬) Mukherji, Santi L., *The Philosophy of Man-Making : A Study in Social and Political Ideas of Swami Vivekananda*, New Central Book Agency (P) Ltd., Kolkata, Second Ediciton, 2008, p. 58

ন্থপঞ্জি

নিবেদিতা, ভগিনী, 'স্বামীজিকে যে রূপ দেখিয়াছি', অনুবাদক : স্বামী মাধবানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭৫

পাণিগ্রাহী, উমাপদ, 'সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব ও চিন্তাধারার ইতিহাসের রূপরেখা : পশ্চিমী ও ভারতীয়', কল্যাণী পাবলিশার্স, লুধিয়ানা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৬।

বিবেকানন্দ, স্বামী, 'আমার ভারত অমর ভারত', প্রকাশক স্বামী সুপর্ণানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার, কলকাতা সম্পাদিত, ১৯৮৬।

ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, 'ভারতীয় দর্শন', বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২০।

সাঁতরা, অরুণকুমার, 'ভারতীয় দর্শন', অভিনব প্রকাশন, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৫।

Bhajanananda, Swami, *Harmony of Religions from the Standpoint of Sri Ramkrishna and Swami Vivekananda*, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, 2000.

Budhananda, Swami, *The Mind and It's Control*, Advaita Ashrama, Kolkata, 2015.

Exploring Harmony among Religious Traditions in India, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, 2010

Lokeswarananda, Swami, *Religion Theory and Practice*, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, 2013.

Vivekananda, Swami, *Vedanta Philosophy*, Advaita Ashrama, Kolkata, 2013.

Vivekananda, Swami, *The Complete Works*, Advaita Ashrama, Kolkata, Vol. II, 1989.

Vivekananda, Swami, *The Complete Works*, Advaita Ashrama, Kolkata, Vol. III, 1989.

Vivekananda, Swami, *The Complete Works*, Advaita Ashrama, Kolkata, Vol. IV, 1989.

Vivekananda, Swami, *Universal Ethics & Moral conduct*, Advaita Ashrama, Kolkata, 2001.

Mukherji, Santi L, *The Philosophy of Man-Making : A Study in Social and Political Ideas of Swami Vivekananda*, New Central Book Agency (P) Ltd., Kolkata, 2008.